The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXV, 2019 (pp. 117 - 130)
Published in December, 2023

বাংলাদেশের নাটকে অ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাব

ফাহমিদা সুলতানা তানজী*

প্রতিপাদ্যসার

বক্ষ্যমাণ গবেষণাটি বাংলাদেশের নাটকে **অ্যাবসার্ড** চেতনার প্রভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রচলিত অর্থে **অ্যাবসার্ড** শব্দটির অর্থ হচ্ছে ঐক্যহীন, অসঙ্গত, নিরর্বোধ, বোকা প্রভৃতি। শিল্প সাহিত্যে শব্দটি প্রথমে ফ্রান্স নিয়ে আসে। শব্দটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জ্য পল সারত (১৯০৫-১৯৮০)ও আলবেয়ার কামু (১৯১৩- ১৯৬০)ধারাটি নিয়ে গবেষণা করেছেন। উভয়েই মানুষের বিপন্ন জীবনকে দেখিয়েছেন। জীবনের কোন অর্থ নেই , উদ্দেশ্য নেই। শূন্য থেকে শুরু, শূন্যতে শেষ। জীবন কোন সমস্যার সমাধান দেয় না কিংবা , কোন উদ্দেশ্যের কথা বলে না। মানুষের এই মানসিক অবস্থাটাই **অ্যাবসার্ড**। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারাটি নিয়ে কাজ করার প্রয়াস চালিয়েছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) ও সাঈদ আহমদ(১৯৩১-২০১০)। তবে নাট্যকার সাঈদের বাংলা নাট্যে ধারাটি সফলতা পায়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাঁদের নাটকের সহায়তা নিয়ে মূল সত্যকে উন্মোচনের প্রয়াস চালানো হবে। আর এক্ষেত্রে জানা উপাত্তকে ব্যবহার ও জ্ঞাত জ্ঞানকে প্রয়োগ করে অনাবিষ্কৃত সত্যকে উন্মোচন করার প্রয়াস চালানো হবে।

ভূমিকা

অ্যাবসার্ড শব্দটি ল্যাটিন *absurdus* থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার ব্যবচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় ঐক্যহীন, অসঙ্গতিপূর্ণ, রূপকভাবে, অসঙ্গত, অনুভূতিহীন, নির্বোধ, বোকা। ফ্রান্স শিল্প সাহিত্যে অ্যাবসার্ড ধারণাটি নিয়ে বাক্যের অসঙ্গতি আসে। শব্দটিকে ব্যবচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় হাস্যকর, অযৌক্তিক, পৌনঃপুনিক, অসঙ্গতিপূর্ণ প্রভৃতি। এতে মানব জীবনের যৌক্তিক অনুপাত বা সম্পর্কের সুবিন্যস্ত রূপ থাকে না। শব্দটির অন্তর্নিহিত দর্শন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইউরোপে ব্যবহার হওয়া শুরু হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ফ্রান্সের নোবেল বিজয়ী অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জ্য পল সার্ত (১৯০৫-১১৮০) ও আলবেয়ার কামু (১৯১৩-১৯৬০) এর রচনায় এটি

*সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রস্ফুটিত হয়। উভয়ে তাদের রচনায় দেখিয়েছেন নির্বান্ধব বৈরী পরিবেশে বিচ্ছিন্ন, বিপন্ন জীবন। এই জীবনের কোন অর্থ, উদ্দেশ্য নেই। শূণ্য থেকে শুরু, শূন্যতে শেষ। প্রায়োগিক দিক থেকে অ্যাবসার্ড শব্দটিকে ব্যবচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় সুনির্দিষ্ট প্লট, চরিত্রায়নের অভাব; আদি-মধ্য- অন্তের অনির্দিষ্ট রূপ; অব্যক্ত থিম; অপ্রাসঙ্গিকতা; পৌনঃপুনিকতা; হাস্যকর; সংলাপের অদ্ভুত, উদ্ভট পরিস্থিতির উপস্থিতি। আর তাই তো বলা হয়ে থাকে life is absurd (westphal, J. & Cherry, C. 1990, 199), অন্যান্য অস্তিত্ববাদীদের মতই থমাস নাগেল (১৯৩৭) একথা বিশ্বাস করেন। অ্যাবসার্ড পরিস্থিতিকে নাগেল ব্যাখ্যা করেছেন বাস্তবতা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অসঙ্গতি হিসেবে। ডেনমার্কের দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্দ (১৮১৩- ১৮৫৫) এবং আলবেয়ার কামু এর অ্যাবসার্ড ধারণা প্রায় এক, যদিও কামু তাঁর *The Myth of Sisyphus (1942)* এ দার্শনিক আত্মহত্যা নামক অধ্যায়টিতে কিয়ের্কেগার্দ এর অ্যাবসার্ড ধারণার বিরুদ্ধে বলেছেন। আদতে অ্যাবসার্ড ধারণাটি জীবনের অর্থ কিংবা উদ্দেশ্যের কথা বলে না অথবা সমস্যার কোনো সমাধান দেয় না। It is true that they start from a shared perception of the forlornness of the human situation (Berthold, D. 2013, 137*)*। প্রতিটি মানুষ জীবনের যাত্রাপথে বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা প্রত্যেকে সময়ের অংশ এবং প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা এতটা ভীতিকর থাকে যে সবচেয়ে দুর্বলতম শত্রুটিকে চিনতে তাদের কষ্ট হয় না। তারা অনাগতের জন্য হন্যে হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, যাতে আতঙ্কগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে। মানুষের এই মানসিক অবস্থাটাই হচ্ছে অ্যাবসার্ড। পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে ইউরোপীয় এবং আমেরিকান অস্তিত্ববাদী প্রবক্তাগণ আলবেয়ার কামু এর *The Myth of Sisyphus* এ বর্ণিত অ্যাবসার্ড বিষয়ক ধারণার সাথে একমত পোষণ করেন। ফ্রান্সের আলফ্রেড জারি (১৮৭৩-১৯০৭) ***Ubu roi*** নাটকটির মাধ্যমে অ্যাবসার্ড এর জগতে অগ্রদূত হিসেবে পা রাখেন। নাট্যসাহিত্যে হাঙ্গেরির বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ প্রযোজক, নাট্যকার, সাংবাদিক, অনুবাদক, ক্রিটিক ও নাটকের অধ্যাপক মারটিন এসলিন (১৯১৮-২০০২) পাঠকের সাথে ধারাটির পরিচয় ঘটান তাঁর ***The theatre of the Absurd*** গ্রন্থটির মাধ্যমে। তৎকালীন সময়ের মধ্যে এ ধারণাটি সাহিত্যের সাথে সাথে নাটকের সাথেও মিশে যায়। ইউরোপে যারা এ ধারাটি নিয়ে কাজ করেছেন, তাদের মাঝে পর্তুগালের ফ্রান্স কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪) এর মেটামরফসিস (১৯১৫), ট্রায়াল (১৯২৫)। আমেরিকান নাট্যকার এডওয়ার্ড আলবি (১৯২৮-২০১৬) এর The Zoo Story (1958), Who's Afraid of Virginia Woolf? (1962), Three Tall Women (1994); আইরিশ ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ছোটগল্পের রচয়িতা, নাট্যনির্দেশক, কবি, অনুবাদক স্যামুয়েল বেকেট (১৯০৬-১৯৮৯) এর *Waiting for Godot* (1948-1949), *Endgame* (1955-1957), Happy days (1961) প্রভৃতি; রোমানিয়ান-ফ্রান্সের নাট্যকার ইউজিন আয়নেস্কো (১৯০৯-১৯৯৪) এর The Lesson (1951), Salutations (1950), The Chairs (1952), The Leader (1953) প্রভৃতি; ব্রিটিশ নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা হ্যারল্ড পিন্টার (১৯৩০-২০০৮) এর No Man's Land (1975), Betrayal (1978), The Birthday Party (1957), The Room (1957) এর কাজ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে পাশ্চাত্যের মতো, বাংলা নাট্যসাহিত্যেও এর প্রভাব পড়তে থাকে। বাঙালি নাট্যকারগণের মাঝে মূলত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), বাদল সরকার (১৯২৫-২০১১) এবং সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০) অ্যাবসার্ড ধারণাটি নিয়ে কাজ করেছেন। বাংলাদেশের নাট্যকারগণ কীরূপে পাশ্চাত্যের এই ধারাটিকে স্বীয় নাটকের সাথে একীভূত করেছেন এবং এর প্রভাব কীরূপ তা বর্তমান প্রবন্ধে অনুসন্ধান চালানো হবে।

অধ্যয়ন পদ্ধতি

বক্ষ্যমাণ গবেষণাটিকে সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়াস চালানো হয়েছে। মূলত: সত্যকে অনুসন্ধান করা বক্ষ্যমাণ গবেষণার উদ্দেশ্য। প্রবন্ধে জানা উপাত্তকে ব্যবহার এবং জ্ঞাত জ্ঞানকে প্রয়োগ করে অনাবিষ্কৃত তথ্য ও সত্যকে তুলে ধরা হবে। এক্ষেত্রে নির্ভুল তথ্যের সমাহার, বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের সম্মিলন এবং নিরপেক্ষ ও সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ গবেষণাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে (সামাদী, স., সাইফুজ্জামান, গ. ম., & হাসান, ম. ম. ২০১৭, ১৫)। বক্ষ্যমাণ গবেষণাটি বাংলাদেশের নাটকে এ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ গবেষণাটি সম্পূর্ণ টেক্সট নির্ভর।

> Dramatic text has the strange fate of being claimed by two fields of art and it is ascribed a variety of functions, possibilities and ways of existence according to type of arguments (and sometimes good will to solve problems not incidental to the field itself (Prochazka, M. (n. d.).

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের কেন্দ্রে যে দু'জন নাট্যকার আছেন (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সাঈদ আহমদ) তারা দু'জনই অত্যন্ত প্রতিভাধর। স্বীয় লেখনীসূত্রে তাদের নাটকগুলো হয়েছে অনন্য। তাই বাংলা ভাষায় তাদের নাটক নিয়ে গবেষণা হওয়া জরুরি। অতীতেও তাদের নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। সেই সকল গবেষণার সূত্র ধরে নতুন সত্যকে উন্মোচন করা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধকারের উদ্দেশ্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাবসার্ড চেতনার সূচনা থেকে শুরু করে কিরূপে বাংলাদেশের নাটকে প্রভাব বিস্তার করেছে তুলনামূলক (comparative) উপায়ে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। গবেষণার কাজে সুস্পষ্ট অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশের দুজন খ্যাতনামা নাট্যকারের নাটকের সহায়তা নিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে, এদেশের নাটক কোন অংশেই বিশ্বখ্যাত নাটকের মানদণ্ডের তুলনায় হীন নয়, বরং এদেশীয় এ ধারাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ, নিজ রসে,স্বীয় সাহিত্যের রীতিতে। অর্থাৎ ইউরোপীয় প্রভাব থাকলেও এদেশীয় নাট্যকারগণ জাতিগত রুচিকে ভুলে যাননি আবার মানদণ্ডের বিষয়েও লক্ষ্য রেখেছেন বিশেষভাবে। তাই ভিন্নরীতির প্রভাব থাকলেও এদেশীয় নাটক হয়েছে স্বীয় আলোয় আলোকিত।

অ্যাবসার্ডিজম

Absurd is that which has no purpose, or goal, or objective. (Esslin. M. 1960, 4)। আক্ষরিকভাবে Absurd শব্দটিকে ব্যবচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় অর্থহীনতা, উদ্ভট, অসঙ্গতিপূর্ণ, হাস্যকর, অদ্ভুত প্রভৃতি। পৃথিবীতে মানুষ সবকিছুর অর্থ বের করার চেষ্টা করে, আদতে ফলাফল হয় শূন্য। মানুষ পৃথিবীতে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে, যেখানে কার্যকর যোগাযোগ ঘটানো সম্ভব হয় না। মার্টিন এসলিন (১৯১৮-২০০২) এ বিষয়ে নেলসন (১৯০৬-১৯৯৮) এর উদ্ধৃতি থেকে এভাবে বলেছেন,

> Absurd is a kind of drama that presents a view of the absurdity of the human condition by the abandoning of usual or rational devices and by the use of nonrealistic from... Conceived in perplexity and spiritual anguish, the theatre of the absurd portrays not a series of connected incidents telling a story but a

pattern of images presenting people and bewildered beings in an incomprehensible universe (Ullah, Iqbal and Rahman, A., 2016, 48).

১৯১৬ নাগাদ ডাডাইজমের সময় একদল শরণার্থী শিল্পি যখন সুইজারল্যান্ডে একত্রিত হয়েছিলেন তখন অ্যাবসার্ডিজমের শৈল্পিক দিক উন্মোচন হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন ডাডাইজম ছিল অপ্রতিরোধ্য সমাজের শিল্পীদের সচেতনতার ফসল। যা বিশ শতকের অযৌক্তিক অভিজ্ঞতাকে ন্যায্যতা দিতে চেয়েছিল এবং এই যৌক্তিক ন্যায্যতাকে তারা ব্যবহার করেছিল। In fact, they reflected the absurdity of rational principles and ideals of society, and highlighted artistic expression with independence of rational control (exir and Anushiravani, 2020, 136), অন্যদিকে Theatre of the absurd and existentialism share common themes' (exir andAnushiravani, 2020, 137)। Dorczak এর মতে, অস্তিত্ববাদ অ্যাবসার্ডিজমের রাজ্যে সবচেয়ে উর্বর দর্শন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। she adds that absurdism, relying on philosoplical sources, was welcomed in the domain of the theatre in the----- (exir and Anushiravani, 2020, p.137)। Absurd শব্দটিকে নাট্যসাহিত্যের সাথে সর্বপ্রথম পরিচয় করালেন মার্টিন এসলিন (১৯১৮-২০০২) তাঁর *theatre of the absurd (*1961*)* বইয়ের মাধ্যমে। Esslin এর মতে, the Theatre of the Absurd merely communicates on poet's most intimate and personal intuition of the human situation, his own sense of being, his individual vision of the world.
(https://sites.udel.edu>britlitwiki> বইটিতে এসলিন দার্শনিক আলবেয়ার কামু এর *The myth of sisphus (1942)* দ্বারা অ্যাবসার্ড কে ব্যাখ্যা করেছেন। অ্যাবসার্ড তত্ত্বটিকে এরপর বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আইনেস্কো এর মতে, cut off from his religious, metaphysical, and transcendental roots, man is lost, all his actions become senseless, absurd, useless (exir and Anushiravani, 2020, 137)। কামু মনে করে মানব মন সহজাতভাবেই সুখ ও প্রজ্ঞার অনুসন্ধান করতে থাকে। মহাবিশ্বে মানুষ হঠাৎ নিজেকে অবাঞ্ছিত ও অসামঞ্জস্য বলে মনে করে। নিজেকে তার অপরিচিত বলে বোধ হয়। কোনোরকম প্রতিকার ছাড়াই সে নিজেকে নির্বাসনে দিয়ে দেয়। এই মানুষ ও তার জীবনের মধ্যকার যে অনুভূতির উদ্রেক ঘটে, সেখানেই অ্যাবসার্ডিটির জন্ম।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এভাবে বলা যায়, অ্যাবসার্ড অবস্থায় মানুষ বোধহীন হয়ে যায়, নিজেকে হারিয়ে ফেলে এবং বিচ্ছিন্ন করে ফেলার প্রবণতা থাকে। এখানে চূড়ান্ত কোন সমাধান পাওয়া যায় না এবং শেষাবধি নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এ্যাবসার্ডিটিতে মৃত্যুকে সবচেয়ে প্রতিক্ষীত বিষয় বলে মনে করা হয়। এটি (মৃত্যু) অবশ্যই যে কোন মানুষের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই এই দিনটির জন্য মানুষ প্রতীক্ষা করে এবং কীভাবে দিনটি উদযাপিত হবে তা নিয়ে একধরণের পরিকল্পনা করে থাকে। এখন প্রশ্ন আসে, মৃত্যুর ভয়াবহতার কথা জেনেও একে সাদরে অভ্যর্থনা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করিয়ে দিনটি উদযাপণের কারণ বিষয়ে। এর একধরণের উত্তর হতে পারে এভাবে, কিছু মানুষ জীবন থেকে পালিয়ে যেতে চায়। এ্যাবসার্ডিটি হচ্ছে মানুষের জীবনের হতাশা, যেখানে মানুষ বাধ্য হয় প্রতিকার খুঁজতে। এই পথে সে মৃত্যুকে আফিমের ন্যায় নিজের দিকে টানতে থাকে। কারণ মৃত্যুই এই হতাশাজনক অবস্থা থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাবসার্ড শব্দটি শূন্যতা, অর্থহীনতা, উদ্ভট প্রভৃতি শব্দের সমার্থবোধক শব্দরূপে পরিচিত হয়েছে। তবে দেশ, কাল, জাতি, রুচি প্রভৃতির কারণে এই ধারাটি খুব একটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। পৃথিবীতে

৫.৭ মিলিয়ন হোমো সেপিয়েন্স-এর মাঝে এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসী। বাংলাদেশের অধিবাসীগণ দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত। বৃটিশ শাসনের বহুশত বছর পূর্ব থেকেই এদেশের জনগণ ঔপনিবেশিক শাসনে শোষিত হয়ে আসছিল। এতকিছুর মাঝে থেমে থাকেনি বাঙালির সংস্কৃতি চর্চা। পালাগান, কবিগান প্রভৃতির মাঝে টিকে ছিল এদেশীয় জনগণের বিনোদন। বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ হওয়াতে এদেশকে বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু আশাবাদী মানুষের মাঝে শূন্যতা, অর্থহীনতা অতোটা দানা বাঁধতে পারেনি, যতোটা পেরেছিল বন্যা, সাইক্লোনের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভীতি। তারপরও বাঙালি আশাহীন নয়। শত দুঃখের মাঝে সে রচনা করেছে মিলনের অপূর্ব গাথা। এরমধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস যাদের মাঝে লক্ষ্য করা যায়, এবং যারা বাংলাদেশে অ্যাবসার্ড তত্ত্বটিকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করেছেন, তাদের মাঝে অন্যতম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) ও সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০)। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাদের নাটকগুলো বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের নাটকে এ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাব নিরীক্ষণ করা হয়েছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এবং তাঁর নাটকে অ্যাবসার্ডিটি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি সমকালীন চেতনাকে সাহিত্যে ধারণ করতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি সাহিত্য নির্মিতির মধ্যদিয়ে যুগোত্তর হয়েছেন। তাঁর রচনাশৈলীর অনন্যতার কদর পাঠকসমাজ বুঝে ওঠার আগেই তিনি জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে গেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মাত্র চারটি নাটক রচনা করেছেন। এগুলো হলো- *বহিপীর, উজানে মৃত্যু,তরঙ্গভঙ্গ, সুড়ঙ্গ।* এছাড়াও তিনি উপন্যাস, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করেছেন। শিল্পভাবনার বলয় থেকে তিনি নাট্যরচনার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অনুসন্ধান যেহেতু বাংলাদেশের নাটকে অ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাব আর এই অনুসন্ধানের সূত্রসমূহ ওয়ালীউল্লাহের *উজানে মৃত্যু* নাটকে পাওয়া যায়, সেহেতু *উজানে মৃত্যু* নাটকটি প্রথমে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হবে। নাটকটি পাঠান্তে যে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয় সেটি হলো এতে ইউরোপীয়রীতির প্রয়োগ এবং এটি নাট্যকারের লেখনীর মোহন বৈচিত্র্যে হয়ে উঠেছে বাংলাসাহিত্যের এক নবদিক। নাটকটিতে তিনি দেখিয়েছেন, শূন্যতার মাঝে নৌকাবাহক এবং সাদা পোশাকধারী ও কালো পোশাকধারীর সত্যসংক্রান্ত প্যারাডাইম। যা পাঠককে ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর বলয়ে নিয়ে গেছে। ফলে নাট্যকার নাটক রচনায় নিজস্ব রীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

হোমারের ওডিসিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, করিন্থের রাজা ইয়োলাসের পুত্র সিসিফাস নরকে এক বিশাল প্রস্তরখণ্ড পাহাড়ের ওপরে নেয়ার জন্য আদিষ্ট হয়। রক্ত, ঘামে সে যতোবার পাথরটি ওপরে তোলে ততোবারই নিচে পড়ে যায়। চলতে থাকে সিসিফাসের ব্যর্থ প্রয়াস। আলবেয়ার কামু তাঁর *The Myth of Sisyphus* গ্রন্থে অ্যাবসার্ড নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বইয়ের নামের শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন হোমারের এই সিসিফাসের একই কাজ বারবার করার কারণ। ওয়ালীউল্লাহের *উজানে মৃত্যু* নাটকেও নৌকাবাহকের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় সে নাটকের শুরু থেকে শেষাবধি কখনো নিরলসভাবে আবার কখনোওবা ক্লান্ত ভঙ্গিতে নৌকা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এতেই যেন তার মুক্তি। হঠাৎ উড়ন্ত

বালিহাঁস তার দৃষ্টিগোচর হয়। ক্লান্ত দেহে বালিহাঁসকে তার মনে হয় সোনালী বালু। এ যেন হঠাৎ মৃত্যুকে দেখতে পাওয়ার সামিল। এখান থেকেই নাটকটির যাত্রা। সূর্য মাথার ওপর ওঠা থেকে শুরু করে সন্ধ্যার আগের সময়ের মধ্যে অনন্য কুশলতায় বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনার সমন্বয়ে নাটকটির প্লট সাজানো হয়েছে, যা সাধারণের চোখে মনে হতে পারে অর্থহীন বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা। অ্যাবসার্ড শব্দটি বিশ্লেষণে প্রবন্ধের প্রারম্ভে এই অর্থহীনতার কথাই বলা হয়েছে। সুস্পষ্ট কোনো গল্পের সূত্র নাটকটিতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু নৌকাবাক সামনে এগিয়ে চলছে who has to search for the meaning (Ullah Irfan, Iqbal Liaqat & Rehman 2016)। জীবনের খরস্রোতা নদী যেখানে তুঙ্গতরঙ্গে ছুটে চলছে, সেখানে মৃত্যুর আগমনী বার্তা মৃদঙ্গের মৃদু শব্দে নিস্পন্দ করে তোলার প্রয়াস চালিয়ে থাকে। অ্যাবসার্ডিটিতে মৃত্যু একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাকে আলিঙ্গন করতে চায় মানুষ।

ভ্লাডিমির: ...এবার কি করবো আমরা?

এস্ট্রাগন: অপেক্ষা করবো।

ভ্লাডিমির: হ্যাঁ, কিন্তু অপেক্ষা করে থাকার সময়টুকুতে।
গলায় ফাঁস দিলে কেমন হয়?... এসো, এক্ষুণি ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ি। (বেকেট, স., ২০০৬, পৃ. ৩৩)

কারণ চলার পথের প্রশ্নগুলোর যথার্থ উত্তর না পেয়ে সে শূন্যতায় নিমজ্জিত হয়ে হতাশায় জর্জরিত হতে থাকে। নৌকাবাহক ও সাদাপোশাকধারীর সম্বন্ধহীন কথায় জানা যায়, সূর্য মধ্য আকাশে। তাই নৌকাবাহকের বিশ্রাম জরুরি। কিন্তু তার হাতে বিশেষ সময় নেই। সাদা পোশাকধারীর বিপরীতে কালো মেঘের ঘনঘটার ন্যায় আবির্ভাব ঘটে কালো পোশাকধারীর। সাদার বিপরীতে কিছু কথাপুচ্ছ দাঁড় করায় কালো পোশাকধারী। নৌকাবাহকের চলনের সাথে বিষছন্দ ঘণ্টা বাজাতে থাকে সে। এমতাবস্থায়, জীবনের ধ্রুব সত্যকে বাতিল করে দিয়ে, এমনকি অস্তিত্বের বিষয়টিও বাতিল করে মৃত্যুর মধ্যদিয়ে বাস্তবতা থেকে রেহাই পাওয়ার বিষয়টি নৌকাবহকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। একটু একটু করে জমা প্রতিদিনের ধূসরতা নৌকাবাহককে টেনে নিয়ে চলে। তার সময়কে বহন করে নিয়ে যেতে হচ্ছে। সে বেঁচে ছিলো ভবিষ্যতের ওপর ভর করে। নদীর ওপারে সে পৌঁছাবে এমন ভাবনাকে সে আঁকড়ে ধরে আছে। এই ভাবনাটি বিস্ময়কর, কারণ তার যাত্রাপথে মৃত্যু জড়িয়ে আছে। সে সময়ের সাথে নিজেকে জুড়ে নেয়, সময়ের মাঝখানে নিজেকে স্থাপন করে। সে মেনে নেয় যে, তার যাত্রাপথের শেষাবধি পৌঁছনোর সময় একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে হয়ে পড়েছে সময়ের অংশ। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সে। কারণ সে তার দুর্বলতম শত্রুকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। নদীর বিপরীত তীরের জন্য ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে সে, যাতে মনের আতঙ্ককগুলো ঝেড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু সে a conspicuous discrepancy between pretention or aspiration and reality লক্ষ্য করে (Velleman, J. D. 2013, 89)। যেখানে অস্বাভাবিকতা বিরাজ করছে, সেখানে সে লক্ষ্য করে যে, পৃথিবীটা স্থুল। মানুষের ওপর এ্যাবসার্ড ততোটাই নির্ভরশীল যতোটা নির্ভরশীল সে পৃথিবীর ওপর। এই বিশেষ সময়টাতে তারা এক সূতায় গাঁথা থাকে। মন যখন তার গণ্ডিকে পেরিয়ে যায় তখন অবশ্যই স্বীয় বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এটাই তার মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার ক্ষেত্র। পূর্বের অভিজ্ঞতাগুলো তার মনে পড়লেও সে কিছুই বর্জন করতে পারে না। পূর্বের অভিজ্ঞতার প্রভাব সে বুঝতে গিয়ে যুক্তিহীনতার মাঝে পড়ে যায়। নৌকাবাহক পরিণত হয় একজন ব্যর্থ শ্রমিক হিসেবে। তার সমস্ত শ্রম, কেন্দ্রহীন গতিময়তা পথের সাথে জড়িয়ে যায়, ধেয়ে আসে মৃত্যু। এভাবে সর্বদিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, জীবনের হতাশা এবং

স্থবিরক্রিয়ার বিপরীতে নৌকাবাহক বাধ্য হয়েছিলো প্রতিকার খুঁজতে এবং মৃত্যুর দিকে আকর্ষিত হয়েছিলো যথার্থ প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে। এখানে নাট্যকার এক ধরণের শূন্যতার সৃষ্টি করেছেন। সবশেষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের বিষয়ে বলা যায়, তিনি *উজানে মৃত্যু* নাটকে দেখিয়েছেন গৃহহীন, শ্রীহীন, অর্থহীন, একাকিত্বকে। বস্তুত তিনি ছিলেন theist existentialist। নৌকাবাহকের যাত্রা তীব্র যন্ত্রণা দিয়ে শুরু ও শেষ হলেও নাটকের শেষাংশে একধরণের আশাবাদ লক্ষ্য করা যায়। সাদা পোশাকধারী অনবরত তাকে ডেকে যায় সামনে যাওয়ার জন্য। এখানেই আশারবাণী।

সাঈদ আহমদ ও তাঁর নাটকে অ্যাবসার্ডিটি

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০৩১) সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ ছিলো। কোনোটি পর্যবেক্ষণ করেছেন বিশ্লেষণের নিবিষ্টতায় আবার কোনোটিতে বিচরণ করেছেন সৃষ্টির আনন্দে। প্রবন্ধে বর্তমান অংশের আলোচ্য বিষয় তাঁর নাটকের অ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাব। নাট্যকার সাইদ সর্বমোট পাঁচটি নাটক রচনা করেছেন। এগুলো হলো - *কালবেলা*, *মাইলপোস্ট*, *তৃষ্ণায়*, *একদিন প্রতিদিন*, শেষ *নবাব*। পাশ্চাত্য ধারায় প্রভাবিত তাঁর লেখনীর মাঝে *কালবেলা ও মাইলপোস্ট* নাটক দুটোর মাঝে অ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আর্থার আ্যাডামভ, স্যামুয়েল বেকেট, জ্য জেনে, ইউজিন আইনেস্কো, এ্যাডওয়ার্ড এ্যালবি, জাঁ তারদু প্রমুখ ছিলেন অ্যাবসার্ড নাটকের পথিকৃৎ। পাশ্চাত্য ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত নাট্যকার সাঈদ আহমদ দেশীয় নাটকে পাশ্চাত্যের রীতির সংমিশ্রণ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করেছেন। বিষয় উপস্থাপনার অভিনবত্বে সাঈদ আহমদ ছিলেন ব্যতিক্রমী। বিষয়বস্তুতে গতানুগতিকতার লক্ষণ সাঈদ আহমদের নেই।

> কেউ কেউ বলতে পারেন তিনি স্যামুয়েল বেকেট, আয়েনেস্কো প্রমূখ বিশ্ববরেণ্য নাট্যকারের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমি বলি, গ্রহীতা যদি হন প্রতিভাবান তা'হলে সেই ঋণ সুদাসলে খাটিয়ে তিনি নিজে লাভবান তো হনই উপরন্তু যে ব্যবসায়ে তিনি নিয়োজিত তাকেও জ্বলজ্বলে করে তোলেন' (আহমদ, স. ১৩৯৫, ১০)।

তাঁর নাটকে মানুষের পাশাপাশি চরিত্র হিসেবে এসেছে বন্যা, মাইলপোস্ট, তুফান, প্রাণী প্রভৃতি। তার ইংরেজি ভাষায় লেখা *NOT I* নাটকের মাধ্যমে তিনি এ্যাবসার্ডের সুর কণ্ঠে ধারণ করেন। নাট্যকার সাঈদ আহমদ *কালবেলা* নাটকটি ১৯৬২ সালে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে এক বিপ্লব এনে দিয়েছিলো। ১৯৬১ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়। এতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। বহু মানুষ মারাও যায়। *কালবেলার* প্রেক্ষাপট সেই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতাকে কেন্দ্র করে। *কালবেলা* নাটকে প্রচলিত নাট্যকাঠামো অনুসারে আদি, মধ্য ও অন্ত নেই। ঘূর্ণিঝড়ের জন্য দ্বীপবাসীর প্রতীক্ষা। নাটকটিতে দেখানো হয়েছে। Waiting is a process for them- a process of becoming through which they seem to realize that they exist. (sharma, A., 1993, 278)। একসময় ঝড় আসে ও সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নাটকের

পাত্র-পাত্রী ডুবে থাকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায়, অন্তহীন প্রতিক্ষায়। ১৯৬১ সালে রচিত এই নাটকে স্পষ্টতই নৈরাশ্য ও পরাজয় প্রতিফলিত হয়। নাটকটির উনেন চরিত্রটির মাঝে বেকেটের ওয়েটিং ফর গোডো নাটকের বালক চরিত্রটির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। যে পুরোহিতের বার্তা নিয়ে আসে। যে বার্তার জন্য অধির অপেক্ষায় বসে আছে মোড়ল ও আহাম্মদ। নাটকটির পুরোহিতকে Godot এর সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে, বেকেটের নাটকে গোডো আসে না, তার জন্য অপেক্ষা করে ভ্লাদিমির ও এস্ট্রাগন। কিন্তু *কালবেলা-য়* পুরোহিত উপেং আসে। তার কাছ থেকেই মূলত ঘূর্ণিঝড়ের বার্তা আসে। আর এই ঘূর্ণিঝড়ও কোনো না কোনো পরাক্রমশালীর সৃষ্টি। যে নিজে না আসলেও ঝড়ের মাধ্যমে জানান দিয়ে গেছেন তার অস্তিত্বের কথা। এদিক থেকে দার্শনিক বিচারে নাট্যকার সাঈদকে বিচার করলে তাঁকে অস্তিত্ববাদী বলতে হবে। সাঈদের কালবেলা নাটকের চরিত্রদের মুক্তি ঘটে না। প্রথম অঙ্কে মেয়েটি (নিবেদিতা) রহস্যময় বার্তা দেয় সবাইকে। মেয়েটি হঠাৎ বলে ওঠে, আসছে, ঐ যে আসছে। ঐ যে আসছে। আমি তোমাদের বলবো। ভবিষ্যতের কথা বলবো। সব বলবো। মানবতার ভবিষ্যতের কথা। (সম্পা- হ. আ., হাই. ২০১২, ১৫)। দ্বিতীয় অঙ্কে ঘূর্ণিঝড় সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে নিয়ে যায়। নিবেদিতা হাসে আবার কাঁদে। সে বর্তমানের আধারে ভবিষ্যতের বাণী বহন করে। আবার সে বলে, কে ডাকে আমায়... আমি আসব... আর কক্ষনো দেরি করব না আমি... ওরা সবাই এমন কাহিনি বলে যে তোমার কণ্ঠ ডুবে যায় ওতে। ... কক্ষনো দেরি করব না আমি ... এখনই রথ ছেড়ে দিবো না, না, ... না ... দিয়ো না ...। (সম্পা-হ., আ., হাই, ২০১২, ২৩)। রহস্যময় ও অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক শক্তিমত্তার কাছে মানবতার পরাজয়ের রূপায়ন নাট্যকার সাঈদ একেঁছেন *চর আলেকজান্ডার*-এ (২০২২, জানুয়ারী ২৯) ঘটে যাওয়া এক সাইক্লোনের মাধ্যমে, যার সাথে নিত্য পরিচয় আছে বাংলাদেশের মানুষের। নাটকটির মাঝে দেখা যায় অস্তিত্ববাচক ধারণার প্রভাব। নাট্যকার তাঁর চরিত্রগুলোর অস্তিত্বের মাঝে হতাশা, নিরাশা, শূন্যতাকে স্পষ্টরূপে এঁকেছেন। যদি নাটকটির নাম সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, দেখা যাবে নাটকটির নামের মাঝে আছে বিষাদের সুরছন্দ। *কালবেলায়* নাট্যকার কোন কাল কিংবা কোন বেলার কথা বলছেন তা কেউ নিশ্চিত নয়। যে বেলায় দ্বীপের অধিবাসীরা অপেক্ষা করে আছে তার অর্থ উদ্দেশ্য নাটকটিতে ব্যক্ত হয়েছে, আদতে যা অর্থহীন বলে বোধ হয়। নাটকটির কাল শব্দটি যদি আলাদাভাবে বিশেষায়িত করা হয়। তবে দেখা যাবে, বেলা শব্দটি গাণিতিক দৃষ্টিতে তিনটি। অর্থাৎ এটি বিজোড় সংখ্যা। এই বেলা যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিও বিজোড় এবং একা। দ্বীপের সবাই সম্মিলিতভাবে অপেক্ষা করে থাকলেও তাদের মাঝে অদ্ভুতভাব, বন্ধ্যাতা, একাকিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যা সমগ্র দ্বীপের পরিবেশকে আশাহত অবস্থানের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। দ্বীপ সমগ্র ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, সেখানকার মানুষজন সমগ্র দেশ থেকে স্বাভাবিকভাবেই বিচ্ছিন্ন। এমতাবস্থায় ঝড়ের আগমনী বার্তায় তাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

এখানেই নাটকটিতে শূন্যতা, বিষাদের ছায়া সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে মৃত্যুই হতে পারে কাঙ্খিত, সবচেয়ে গুরুত্ববহ বিষয়। তবু দ্বীপবাসী বেঁচে থাকার নির্মল বাণী শুনতে চায় নিবেদিতার কাছ থেকে। কিন্তু সে গুনগুন করে গান করা ছাড়া আর কিছুই করে না। প্রত্যেকে ভবিষ্যতের বাণী শোনার আগ্রহে এক সময়ে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। শুকনো পাতা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। কারো কিছুই করার থাকে না। ঢুলী বলে, আমার কাজ বুঝিবা এবার সাঙ্গ হলো। আর ... ঘোষণা করার নেই কিছু। (সম্পা-হ., আ., হাই, ২০১২, ৩১)। এক সময় সব লীন হয়ে যায়। নাটকটির মূল বিষয় অপেক্ষা। চরিত্রগুলো সাহায্য পাওয়ার আশায় শেষাবধি অপেক্ষা করতে থাকে, যদিও অপেক্ষার পর তারা মৃত্যুকেই পায়। নিরন্তর অপেক্ষা চরিত্রগুলোকে হতাশ করে ফেললেও শেষাবধি আশা থাকে

বেঁচে থাকার। সেখানে ব্যর্থ হয়ে নেমে আসে হতাশা, তারপর নীরবতা। অপেক্ষাতে শুরু অপেক্ষাতেই শেষ নাটকটির। অর্থাৎ নাটকটির গঠন বৃত্তাকার যা পূর্ণ অ্যাবসার্ডরীতির নাটককে সমর্থন করে।

১৯৬৫ সালে বাস্তব ও থিয়েটার উভয়ক্ষেত্রেই যখন শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে যেকোন প্রতিরোধের রূপায়ন থেকে বিচ্ছিন্নতায় ভুগছে, ঠিক সেই সময়ে সাঈদ আহমদের *মাইলপোস্ট* নাটকটি বাংলা একাডেমিতে মঞ্চস্থ হয়। সৈয়দ জামিল আহমদের মতে, সাঈদ মার্ক্সবাদী বয়ান পরিহার করে বাচনের এমন এক নকশাকে তার নাটকের ভেতরে বুনেছেন যা বেকেটিয় ধমনী থেকে আসা এক অ্যাবসার্ড ভিশন বা রূপকল্প (মৈশান, শ. ২০১৩)। বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৭৯ সালে মাইলপোস্ট নাটকটি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। নাটকটির মূল বক্তব্য হচ্ছে, জনগণ যদিওবা তাদের জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকে তবু এতে স্যালভেশন বা পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব কি-না এরকম সংশয়ে ভোগে নাটকটি। মাইপোস্টের রচনাকাল ১৯৬২-১৯৬৪। নাটকে দুর্ভিক্ষের সময়ে কয়েকটি চরিত্রের সংলাপের এবং ন্যূনতম ঘটনার ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র আঁকা হয়েছে। সেইসাথে দার্শনিক মাত্রা হিসেবে দুর্ভিক্ষকে মানুষের আত্মার পতন হিসেবে দেখানো হয়েছে। দুর্ভিক্ষ যে শুধু নিরন্নের হাহাকার নয়, মানবাত্মার সঙ্কটের তীব্র আর্তনাদও (সম্পা - হ., আ., হাই, ২০১২, ৩৬)। আদতে শিল্পের নিগুঢ় লক্ষ্য হলো বাস্তব কী তার অবধারণ। অ্যাবসার্ডবাদীরা বাস্তবকে যা ভাবতেন সেই বিষয়ে ডেমোক্রিটাসের একটা উক্তি বেকেট উদ্ধৃত করে যা বলতেন তার অর্থ করলে দাঁড়ায় সবচেয়ে বেশি বাস্তবতা পাওয়া যায় ***না*** শব্দটিকে। ফলে প্রথমে ***না*** শব্দটির মাধ্যমে অবধারণের এই পদ্ধতিটি মহাজগতের বাস্তবকে পাঠের এক বিশেষ পদ্ধতি। আলোচ্য *মাইলপোস্ট* একটি একাঙ্কিকা, যা তিনটি দৃশ্যে বিভাজিত। রাজপথের শূন্যতার মাঝে একজন বয়স্ক চৌকিদার একটি মাইলপোস্ট নিয়ে ঢোকে। সূর্যাস্তের আগে গোধূলির আলোর বন্যায় দর্শককে পেছন করে সে প্রবেশ করে। যুক্তিরহিত পরিস্থিতির দিকে দর্শককে সে আমন্ত্রণ জানায়। চৌকিদার বলে, মনে হচ্ছে সবকিছুই ঠিকঠাক আছে, কোথাও কোন কিছুর ব্যতিক্রম নেই। বাঁশিতে ফুঁ দিই, একটা সুর বেরিয়ে আসে। মাইলপোস্টে আঘাত করি, তার শব্দ এসে কানে লাগে (সম্পা-হ. আ. হাই, ২০১২, ৩২)। প্রয়োজন ও পৃথিবীর অযৌক্তিক নৈঃশব্দের সংঘাতে অ্যাবসার্ডের উদ্ভব। মানুষ তার জীবনের প্রয়োজন মাফিক পরিপূর্ণতা খোঁজে। উপরিউক্ত সংলাপকে আবার যদি আলবেয়ার কামুদৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে, জগৎটা মানুষের বোধগম্যতাকে প্রতিহত করে বলেই এটিকে চেনা সংলাপ থেকে ভিন্ন বলে মনে হচ্ছে। এই চেনা ও অচেনার দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে নাট্যকার সাঈদের *মাইলপোস্ট* নাটকটি যে অ্যাবসার্ডরীতির তা প্রাথমিক অবস্থায় দর্শককে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আলবেয়ার কামু এর মতে, সত্যি যদি কোনো অ্যাবসার্ড থাকে, তবে তা আছে মানুষের ব্যক্তিজগতে (কামু, আ., ২০১৮)। আবার জগতের কাছে মানুষের প্রত্যাশা এবং মানুষের প্রতি জগতের নিস্পৃহতা এই সম্বন্ধসূত্রেও অ্যাবসার্ডরীতির জন্ম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। রাজপথের চৌকিদার যেন মানুষের গন্তব্যের বিষয়ে সন্ধিৎসার প্রতীকী প্রশ্ন ছুড়ছেন, যা প্রাত্যহিক কিন্তু একধরণের সংগীতকুশলতা বিশিষ্ট, সংলাপের অর্থ তাৎপর্যে দার্শনিকতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। যদি কোনো স্থানে কখনো কেউ না আসে কিংবা সেই স্থানে থেকে কখনো কেউ না যায়- তবে এই মধ্যবর্তী জায়গা অনুধাবনের উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। আদতে এই

পরিস্থিতি মানব দশার জন্য হাস্যকর ও অযৌক্তিক। আলবেয়ার কামু এর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে চৌকিদার বলতে থাকে, হ্যা আমরা দু'জনই অজানার অন্ধকারে ডুবে রইলাম, তুমি কবর খুঁড়ে লাশ শুইয়ে দাও, আমি রাজপথে পাহারা দিই আর মাইলপোস্ট নাড়াচাড়া করি। আমরা কেউ কাউকে চিনি না। অনন্তকাল ধরে আমরা অর্থহীন। এ-ই আমাদের সবচেয়ে বড় মিল। আমরা মূর্খ (সম্পা -হ., আ., হাই, ২০১২, ৩৬)। আলবেয়ার কামু জগতের নৈঃশব্দকে সমর্থন করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে জগৎটাকে প্রাঞ্জলতা ও পরিচয়তার মধ্যে নিয়ে আসা মানুষের ঐকান্তিক প্রয়াস আদতে জগৎটাকে মানুষের মাপে নামিয়ে আনার সামিল। বরং এরচেয়ে জগৎকে ইন্দ্র দিয়ে অনুভব করা শ্রেয়। যেহেতু আমরা পৃথিবীর মধ্যে স্থিতবস্তু ছুঁয়ে দেখতে পারি ; মাটি, জল, বায়ু অনুভব করতে পারি সেহেতু পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে। আদতে মানুষের এইটুকুই জ্ঞান, বাকি সব নির্মাণ। ব্যক্তির অস্তিত্ব ও বস্তু জগতের বাইরের জ্ঞান মানুষের আয়ত্বে থাকে না। এখান থেকেই *নিহিলিজমের* সূত্রপাত। যদিও আলবেয়ার কামু এক্ষেত্রে নিহিলিজমকে স্বীকার করেননি তবু তিনি এখান থেকে দেকার্তের systematic doubt এর সাথে নিজের ধারণার সাযুজ্য লক্ষ্য করেছেন। মাইলপোস্ট নাটকটিতে নাট্যকার সাঈদ সংশয়কে অবলম্বন করে পথ খুঁজেছেন। এক অলঙ্ঘনীয় নিয়তির ছকে বাঁধা জীবনের অর্থহীনতা উন্মোচিত হয় নাটকটিতে। নাটকের ক্রীড়ক হলো দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের ক্রীড়ক হলো মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক শর্তাবলি এমন অ্যাবসার্ড ভাবধারার প্রকাশকে স্ফূর্তি দিয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের সামাজিক ইতিহাসের যাত্রাটিকে অ্যাবসার্ড ভাবধারার সাথে মিশিয়েছেন। চৌকিদারের সংলাপ থেকে জানা যায়, দুর্ভিক্ষ ঘাসের কচি শিষটি পর্যন্ত খেয়ে নিঃশেষ করেছে। গায়ের চামড়া টানটান হয়ে ঢোলের মতো হয়ে গিয়েছে। ফোসকা পড়া গরমে সব পুড়ে দগদগে ঘায়ের জন্ম দিয়েছে। এ অবস্থার মধ্যে মানুষ আর মানুষ থাকতে পারেনা (সম্পা-হ., আ., হাই, ২০১২, ৩৮)। নাটকটিতে প্রথমদিকে নঞর্থকতার উন্মোচনকে আরো তীব্র করতে সাইকেল চালিয়ে ডাকপিয়নের আবির্ভাব ঘটে। এখানে চৌকিদার সত্তাতাত্ত্বিক ontological প্রশ্নটি করে -তুমি কে (সম্পা-হ., আ., হাই, ২০১২, ৩৭)। উদ্ভট মানব দশায় পতিত মানুষের এই প্রশ্নটিও অবান্তর। এমতাবস্থায় কামু সত্য ও মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে নিষ্ঠুর গণিতকে এড়িয়ে যাবার কথা বলেছেন। পরিচয়ের গোলকধাঁধায় পড়ে গোরখোদক যেন আলবেয়ার কামু কে সমর্থন করে বলেন, কী আশ্চর্য প্রশ্ন! পোশাক দেখে বুঝতে পারছো না ও একজন ডাকপিয়ন (সম্পা-হ., আ., হাই, ২০১২, ৩৭)। কিয়ের্কেগার্দ অ্যাবসার্ডকে ভিত্তি করে অন্য একটা জগতের মানদণ্ড খুঁজে নেন।, তার কাছে ঈশ্বর ছাড়া সবই শূন্য ও উদ্বেগের বিষয়। পক্ষান্তরে আলবেয়ার কামু এই উদ্বেগকে গোপণ করে মানুষের আধ্যাত্মিকতার অবস্থার কথা বলেছেন। আমরা সবাই মৌলিক, আমাদের স্থান অপূরণীয় (সম্পা-হ., আ., হাই, ২০১২, ৩৭)। একসময় তারা প্রত্যেককে আবিস্কার করে তারা কেউ মৌলিক নয়। নাটকটির শেষদৃশ্যে আরও তিনটি চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে। মা ঠেলাগাড়িতে বসা ও সাথে তার বড় ও ছোট ছেলে। এরা দুর্ভিক্ষের তাড়া খাওয়া মানুষ। মায়ের কাছ থেকে মরা মানুষের গল্পের বদলে জীবিত মানুষের গল্প বলার প্রত্যয় শোনা যায়। যারা এখনও মৃত্যুর স্বাদ কিংবা সুযোগ পায়নি। নাটকটির দ্বিতীয় দৃশ্যে মাইলপোস্ট কিছুটা সরে গেছে, তার সাথে যুক্ত হয়েছে সাইকেল। এভাবেই নাট্যকার সাঈদ তাঁর *মাইলপোস্ট* নাটকটিতে নিয়তির শাসনকে মানবদশার জরাজীর্ণ অবস্থার সাথে মিশিয়ে বেকেটিয় এ্যাবসার্ড রূপকল্প থেকে সরে এসেছেন। অ্যাবসার্ডের পূর্ণতার চেয়ে তার কাছে মূখ্য ছিলো নাটকের স্থানীয়করণ। নাটককে প্রাথমিকভাবে বেকেটিয় ধমনী আসা অ্যাবসার্ড ভীশন বলা যেতে পারে। তবে সমগ্র নাটকটি একধরণের সংশয়ে ভোগে। সৈয়দ জামিল আহমদ (১৯৫৫) এই নাটকটিকে ১৯৬৯ সালের পটভূমিতে একান্তই ভুল রূপায়ণ বলেছেন। পাকিস্তান

জন্মের পর সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব শাহীর (মৈশান, শ. ২০১৩) পতন ঘটিয়েছিল। ফলে নাটক ও বাস্তবতার রসায়নের প্রেক্ষাপটে *মাইলপোস্ট* নাটকটিতে দেখা যায় ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের বাস্তবতা ও এর ফলাফলের নিরিখ সত্য নয়। বরং দেখা যায়, জীবনের বিনিময়ে রাজনৈতিক পরিত্রাণ আসে (মৈশান, শ. ২০১৩)। এক্ষেত্রে নাট্যকার সাঈদের মাইলপোস্ট নাটকের নাটকীয়তা বিষয়ক প্রশ্ন আসে। যেকোনো সৃষ্টির বড় লক্ষণ হলো সময়ের নিরিখে এর নিহিত প্যারাডক্স। কারণ শিল্প একইসাথে আজকের এবং আজকের নয়। বৈশ্বিক এত সহিংসতার পরও মানুষের বেঁচে থাকার মর্মার্থ বিষয়ক প্রশ্ন আসে। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় নাটকে আলোচ্য পরিত্রাণের বিষয়টি তদন্তযোগ্য বিষয়। নাটকটিতে দুর্ভিক্ষের করুণচিত্র আঁকা হয়েছে। হাসনাত আবদুল হাই বলেছেন, এটি অ্যাবসার্ড নাটক নয় যদিও সংলাপে কখনো কখনো আভাস পাওয়া যায়। একে বলা যায়, আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক নাটক (মৈশান, শ. ২০১৩)। আবার নাট্যজন আতাউর রহমান বলেছেন, সাঈদ আহমদের নাটকের বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন কিছু নয়। তার নাটক বাংলাদেশের নিত্যসহচর তুফান, বন্যা ইত্যাদিকে নিয়েই। তবে তার উপস্থাপনা পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু থেকে নিয়ে নাটকীয় চরিত্রসমূহের ট্রিটমেন্ট ইত্যাদি সব ট্র্যাডিশনাল অর্থে প্রাচ্যের বা বাংলাদেশের নয় (মৈশান, শ. ২০১৩)। সৈয়দ জামিল আহমদ প্রাচ্যরীতির নাটকের গঠন বিষয়ে বলেছেন:

> The action of all text (independent or cycle) are structured on a principle which begins with the birth of desire and ends with fulfilment but the journey from the beginning to the end passes through a series of three successive staged a number of times. These three stages may be termed as (i) Effort, (ii) Possibility of Attainment and (iii) Suppression of Success (Ahmed, S.J., 2000, 339).

১৯৯৩ সালের ২০ এপ্রিল সপ্তাহিক পত্রিকায় *এই শতকের নাটক* নামক প্রবন্ধে সাঈদ আহমদের ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কিত একটি বয়ান হলো, আধুনিক শিল্পচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সম্পূর্ণ নতুন কায়দায় এই ধরনের নিরীক্ষাধর্মী নাটক লিখতে শুরু করলেন (মৈশান, শ. ২০১৩)। তাঁর *উজানে মৃত্যু* নাটকের বাচনভঙ্গির সক্রিয়তা , চিন্তার জটিলতা, জীবনবোধের অসংলগ্নতা দর্শককে অন্য দ্রাঘিমায় অবতারণ করায়, যা নাট্যকার সাঈদ সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার ২০০৫ সালে *The New Age* পত্রিকা মারফত জানা যায়, ড. মারফি আইনেস্কোকে বলেছিলেন, অ্যাবসার্ড নাটকের আধুনিক আঙ্গিকের রচনায় সে (সাঈদ) বাংলার মেটাফর নিয়ে কাজ করে (মৈশান, শ. ২০১৩)। নাট্যকার সাঈদ নাট্যকার ওয়ালীউল্লাহ এর অনুসারী হলেও ওয়ালীউল্লাহ স্বীয় নাটকে অস্তিত্ববাদী চেতনার সংযোজন ঘটিয়েছিলেন, যা *উজানে মৃত্যু* নাটকটি বিশ্লেষণে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রমাণ হয়েছে। অন্যদিকে সাঈদ আহমদের *কালবেলার* নায়ক সাইক্লোন আর মাইলপোস্টের নায়ক দুর্ভিক্ষ। একথা সত্য বাস্তব অবস্থার প্রতিবাদ স্বরূপ নাটক রচনা করেছিলেন। In absurdity, no meaning exists in this universe for man, but it is man himself who has to search for meaning (Ullah, I., Iqbal, L. & Rahman, A., 2016, 48)। যেহেতু অস্তিত্ববাদের সাথে অ্যাবসার্ডের কিছু সাদৃশ্য আছে সেহেতু এসলিন স্পষ্ট করে বলেছেন anti-

realistic post-war drama (Ullah, I., Iqbal, L. & Rahman, A. 2016, 48)। অর্থাৎ যেখানে মানবদশার অর্থহীনতার অর্থ অন্বেষণ করা হয়। এসলিন একে হাস্যকরও বলেছেন। আবার *Camus The myth of Sisyphus* অ্যাবসার্ড দশাকে বিশ্বাস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়া এক পৃথিবীর মানব পরিস্থিতি যাচাই করতে ব্যবহার করেছেন। মানুষ ও জীবনের মধ্যকার বিচ্ছেদের মাধ্যমে মানবদশায় অ্যাবসার্ড পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এসলিন মনে করেন, অ্যাবসার্ড কেবল যুক্তিরহিত বিশ্বাসের দিকে টানে না, বরং মানুষ যে পৃথিবীতে বেঁচে আছে, সেই পৃথিবীর বাস্তবতাকে সম্যকভাবে বুঝতে সাহায্য করে। কিন্তু বাস্তবতার প্রকৃত স্বভাব তর্কমূলক দার্শনিক ভাষা ও যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এদিক থেকে বলা যায়, মাইলপোস্ট নাটকের শেষাংশে নাট্যকার বেকেটিয় ধমনী থেকে সরে এসেছেন। অ্যাবসার্ড শৈলীর চেয়ে তাঁর কাছে নাটকের স্থানীয়করণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর চরিত্রগুলো নির্দিষ্টতার শর্ত উপেক্ষা করে সোনালী ইতিহাসের আশাবাদ ব্যক্ত করে। অন্যদিকে কালবেলায় উপেং পুরোহিত যেন Godot। কালবেলায় চরিত্রগুলোর মুক্তি ঘটে না, তবে বিলয় ঘটে। তৎকালীন পাকিস্তানের শাসন - দমন যেন সাইক্লোন হয়ে চর আলেকজান্ডারে ধেয়ে এসেছিল। নাট্যকার সাঈদ ছিলেন theist existentialist। তাইতো তার উপেং এসেছিল। নাটকটি মানব অস্তিত্বের সমস্যা ও দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। অপেক্ষাতে শুরু, অপেক্ষাতে শেষ। একধরনের বৃত্তাকার কাঠামো নাটকটিতে বিরাজ করে যা অ্যাবসার্ডরীতির পরিপূরক। সর্বদিক বিবেচনায়, নাট্যকার সাঈদ আহমদ *কালবেলা* নাটকটিতে দেশীয় মেটাফর গ্রহণ করলেও বেকেটিয় ধমনী থেকে সরে আসেননি। অতএব,বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটিতে গবেষক সামগ্রিক তত্ত্ব ও তথ্যের বিশ্লেষণে আশা যায় যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যে নাট্যকার সাঈদের *কালবেলা* নাটকটি শেষাবধি অ্যাবসার্ডরীতির শর্তসমূহ পালন করেছে। যদিও তাতে মিশে আছে এদেশীয় ঘ্রাণ। আলোচ্য প্রবন্ধে সৈয়দ জামিল আহমদের বাঙলা নাটক রীতি ও গঠন সংক্রান্ত বয়ানকে মেনে নিলে কালবেলা ছাড়া আর কোন নাটক এ্যাবসার্ডরীতিকে সমর্থন করে না।

বাংলাদেশের নাটকে অ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাব

বাংলাদেশ তো বটে, পৃথিবীর যেকোন দেশের প্রেক্ষাপটে প্রতিদিনের ধূসরতা মানুষকে টেনে নিয়ে চলে। মানুষ বাঁচে ভবিষ্যতের ওপর ভর করে। আগামীকাল, পরে, যখন তুমি পথ খুঁজে পাবে, যখন অনেকটা বয়স হবে- প্রভৃতি শব্দের ওপর ভিত্তি করে আমাদের ভাবনা বয়ে চলে। কিন্তু এই কথাগুলো বিস্ময়কর। কারণ এর সাথে মৃত্যু জড়িয়ে আছে। মানুষ একটা সময় যাত্রাপথের শেষ পর্যন্ত পৌঁছানোর কালে বাঁকে মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। সে হয়ে পড়ে সময়ের অংশ। অনাগতের জন্য ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করে সে। যাতে সে আতঙ্কগুলো ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে। আবার একধাপ নিচে নেমে সে বুঝতে পারে পৃথিবীটা স্থল। ক্ষণিকের জন্য সে হয়ে বোধ শক্তিরহিত। সে সময় মানুষ কৌশল প্রয়োগের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সে বুঝতে পারে পৃথিবীটা তার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তখন পূর্বেকার স্মৃতি মনে পড়ে। তখন সেটা করেছিলাম/তাকে খুব মনে পড়ে প্রভৃতি কথা। নিবিড়তা ও অস্বাভাবিকতার মাঝেই অ্যাবসার্ডের জন্ম। অথবা অনুভূতিটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়- সুবোধ্যতার জন্য মানুষের আদিম আকাঙ্ক্ষার সাথে পারস্পরিক সংঘাত। মানুষের ওপর অ্যাবসার্ড এতোটাই নির্ভরশীল, যতোটা নির্ভরশীল পৃথিবীর ওপর (কামু, আ., ২০১৮, ৪৫)। তারা একই সূতায় গাঁথা। প্রাঞ্জলতা, প্রত্যাখ্যান ও হালকা রসিকতার মধ্যদিয়ে এর প্রকাশ। একটা সময় মানুষের মনে হয়, পৃথিবীটা যুক্তিহীনতায় ভরা। মন তখন নিজের গণ্ডি পেরিয়ে যায়, সিদ্ধান্ত নেয়। তৈরি হয় আত্মহত্যার ক্ষেত্র। অন্তত এভাবেই মন তার প্রতিক্রিয়া জানায়। এখানেই বর্তমান করোনাত্তোর বাংলাদেশের প্রশ্ন-কেন মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে। আত্মহত্যা মূলত মনের বিদ্রোহটাকে অনুসরণ করে। বিবিএস ২০২১ সালের প্রথম ১০

মাসে দেশের মোট মৃত্যুর কিছু কারণ অনুসন্ধান করে ১০ মাসে যখন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে ৫ হাজার ২০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তখন ১১ হাজারের বেশি মানুষ আত্মহত্যা করেছে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)। স্পষ্ট মনে রাখতে হবে, মনের যে বিদ্রোহ তার যৌক্তিক পরিণতি আত্মহত্যা নয়। আত্মহত্যা নিজের চূড়ান্ত স্বীকৃতি। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সে আপ্যায়ন করে অ্যাবসার্ডকে। যেহেতু নাটক জীবন থেকে নেওয়া ঘটনার সাজানো বিন্যাস তাই বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট অ্যাবসার্ড চেতনাটি নিয়ে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রথিতযশা নির্দেশকেরাও সময়ের চাহিদা মেটাতে অ্যাবসার্ড ধারাটি নিয়ে কাজ করেছেন। গত ২১-২৬ মার্চ ২০২২-এ ১৫ তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব ২০২১ এ ড. ইসরাফিল শাহীনের নির্দেশনায় (অনুবাদ- আসাদুল ইসলাম) মঞ্চায়িত হয়েছে ওয়েটিং ফর গডো। চট্টগ্রামের খ্যাতনামা নাট্য নির্দেশক অসীম দাস একই নাটক নির্দেশনা দিয়েছেন ১২ নভেম্বর, ২০২১। পৃথিবীতে মানুষ ক্ষমতাহীন ও বিদ্রোহী। তবে বর্তমান সময়ের মানুষ ইডিপাসের মতো কেবল নিয়তির অনুগামী নয়। যেহেতু সুখ আর অ্যাবসার্ড একই পৃথিবীর দুই সন্তান (কামু, আ., ২০১৮, ১২৯)। অ্যাবসার্ড অনুভুতিতে মানুষ যখন তার কষ্টের কথা ভাবে তখন তার উপাস্য দেবতার যাতায়াতকে সে স্তব্ধ করে দেয়। মানুষ যখন নিজেই সব ক্ষমতার আধার হয়ে যায়, ঈশ্বর সেখানে মৃত। সূক্ষ্মতম মুহূর্তে মানুষ জীবনের পেছনে ফিরে তাকায়। কেন্দ্রহীন গতিময়তায় সে তার পূর্বের স্মৃতি মনে করে, যা তার মৃত্যুর মধ্যে চাপা পড়ে যায়। সিসিফাস যেমন তার পাথরটি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, বর্তমান সময়ের প্রায় প্রতিটি মানুষই তাই করছে। সিসিফাস আমাদের শেখায় আনুগত্য, কাজের প্রতি বিশ্বস্ততা। পৃথিবীটা নিষ্ফল ও নিরর্থক নয়। সিসিফাসের কর্মকাণ্ডকে ব্যর্থতার প্রতীক না ধরে ধনাত্মকরূপে অন্তরে ধারণা করলে নিজেকে সুখী মানুষ হিসেবে গণ্য করাটা কষ্টসাধ্য কাজ হবে না। আর এ কাজটি এদেশীয় নাটকের প্লট গঠনের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করলে হতাশায় নিমজ্জিত বর্তমান বাংলাদেশে মিলবে আলোর সুস্পষ্ট রূপরেখা।

উপসংহার

দেশীয় উপাদান ভিত্তিক নাটকে ইউরোপীয় চেতনা যে কতটা সমৃদ্ধ হতে পারে তার প্রমাণ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও সাঈদ আহমদের নাটক পাঠান্তে অনুধাবন করা যায়। যেখানে সৃষ্টিশীলতা বিদ্যমান, সেখানে নতুন শৈলীর উদ্ভাবন অবান্তর নয়। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে যে আশাহীনতা, ধূসরতা, নিশ্চয়তার একচ্ছত্র আধিপত্য চলছে, তা অতীতে ছিল না তা নয়। অতীত সেজেছিল অতীতের রূপে। বর্তমানে অতীতের লেখনীসূত্র ধরে বর্তমানকে যাচাই করার সুযোগ রয়েছে। বক্ষ্যমাণ দুই নাট্যকারের আলোচ্য নাট্যত্রয় পাঠান্তে। হয়তো সেখান থেকে তারা নব দিগন্তের পথ দেখিয়েছেন, আবার হয়তো তারা একই ঘটনার কেন্দ্রে ঘুরপাক খেয়েছেন, কোনো সিদ্ধান্ত না নিতে পেরে। নাটকগুলোর থিম আজও সমসাময়িক। বাংলাদেশের নাটকে চেতনার প্রভাবকে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধকার অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত মনে করছে। অনেক মহৎ কাজের অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের জাতিগত ইতিহাসে আছে। শেষাবধি মহাশূন্য পরিক্রমায় আমরা একা। অথবা তারা আছে আমাদের সাথে, যারা শেষাবধি ধ্বংসের মাঝে পায়, এগিয়ে যাবার মানসিক শক্তি। আর তা রসিক বাঙালি শিখেছে নাট্যকার ওয়ালীউল্লাহ ও সাঈদ আহমদের

হাত ধরে। হয়তো তাঁরা আশায় বুক বেঁধে মূল সুর থেকে সরে এসেছেন কিছুটা, তবু বর্তমান বিবেচনায় বাংলাদেশের নাটকে এ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাব অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র

আহমদ, স.। *শেষ নবাব* (প্রথম প্রকাশ)। ঢাকা: মুক্তধারা, ১৩৯৫।

কামু, আ.। *দ্য মিথ অব সিসিফাস* (উ. বর্মা, Trans) (প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২৫) এবং মুশায়েরা, ঢাকা: ২০১৮।

বেকেট, স.। *স্যামুয়েল বেকেটের পনেরোটি নাটক* (ক. চৌধুরী এণ্ড শ. কবির, Trans)। (প্রথম সংস্করণ)। বিদ্যা প্রকাশন, ঢাকা: ২০০৬। *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।* Retnieved May 29, 2022, from http://www.bbs.gov.bd

মৈশান, শ. (n.d.*)* *সাঈদ আহমদের নাটকে নিরীক্ষা: অ্যাবসার্ড রূপকল্প, বাংলার মেটাফর উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের অন্বয়* www.theatrewala. Retrieved May 11, 2022.

সামাদী, স., সাইফুজ্জামান, গ.ম., এণ্ড হাসান, ম.ম.। *সাহিত্য গবেষণা বিষয় ও কৌশল* (৩য় সংস্করণ)। ঢাকা: সাহিত্য ভবন, ২০১৭।

হাই, আ.। *সাঈদ আহমদ রচনাবলি*, (1st ed.)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২।

Ahmed, S. J. *Acinpakki Infinity*. (1sted). Dhaka: The Dhaka University Press, 2000.

Berthold, D. *Kierkegaard and Camus: either/or? International Journal for Philosophy of Religion*, 2013. 73(2), http://www.jstor.org/stable/24709214.

Esslin, M. *The Theatre of the Absurd. The Tulane Drama Review*. 4(4), 1960.

http://doi.org/10.2307/1124873 Prochazka, M. (n.d.), *On the Nature of Dramatic Text*, https://slovoasmysl.ff.cuni.cz. Retnieved May 27, 2022. (২০২২, জানুয়ারি ২৯)। *চর আলেকজান্ডার ইউনিয়ন, রামগতি*। bpy.m.wikipedia.org. Retrieved May 27, 2022.

Sharma, A. "*WAITING FOR GODOT": A Beckettian Counterfoil to Kierkegaardian Existentialism. Samuel* 1993. *Beckett Today*/ Aujourd, hui, 2 http://www.jstor.org/stable/25781175

Ullah, I., Iqbal, L., & Rahman, A. *A study of Absirdity in Samuel Beckett's olay Waiiting for Godot and Albery Camus Novel The Outsider. Global Language*. 2016. Review (GLR), 1(2016). Doi- 10.31703/gir.2016 (1-1). 04.

Velleman, J.D. *Life Absurd?: Don't Be Ridiculous. In Foundations for Moral celativism*(1st ed.) , Open Book publishers. 2013. http://doi.org/10.2307/j.clt. svjtsm

Wesrphal, J., & Cherry, C. *Is Life Absurd? Philosophy*. 1990. 65(252). http://www.jstor.org/stable/3759388